182.Kd.908.4.

গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৪শ ভাগ।

NATIONAL LIBRARY
No. mp. 4148
DATE 7.7.09
CALCUTTA

শিক্ষা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ॥০

প্রকাশক—

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
কার্য্যালয়—৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
শাখা দোকান—২০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।

22. SEP. 08

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

শিক্ষার হের-ফের … … … ১

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ … … ২১

শিক্ষা-সংস্কার … … … ৪১

শিক্ষাসমস্যা … … … ৫১

জাতীয় বিদ্যালয় … … … ৮২

আবরণ … … … ৯৭

সাহিত্যসম্মিলন … … … ১২০

BENG LIBRA
19 NOV. 1908
WRITERS' BUIL

শিক্ষা।

শিক্ষার হের-ফের।

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে,

দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোন সখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

সখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাঙালায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখান হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোন বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস্‌ ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে, বড় বড় বি-এ এম্‌-এদের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই! অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বন করিতেছে, বাঙ্গালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মস্‌লা মিশান নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই

হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি-এ এম্-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথাবার্ত্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মত নহে। সেই জন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত

বাঙালী কি করিয়া এড়াইবে কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক ত, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয় ত কোন একটা শিশুপাঠ্য reader-এ hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এই জন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Katie র মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স্ পাস, কেহ বা এণ্ট্রেন্স্ ফেল, ইংরাজি ভাষা, ভাব, আচারব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভাল বাংলা, না জানে ভাল ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো

অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal—বাংলায় তর্জ্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভাল—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত রকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত অল্পবয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্ত এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না—মাষ্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোন মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকুরি জোটে। সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের এই বচনটি খাটে—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্!"

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিও, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কি? যদি কেবল বাংলা

শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতি-জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন, বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়?—বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার,

চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর এক বয়স পর্য্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অম্‌নি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিষ হস্তপদের মত আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোন প্রস্তুত সামগ্রীর মত নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মত মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ।

আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোন কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এণ্ট্রেন্স্ এবং ফাষ্ট-আর্টস্ পর্য্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি-এ ক্লাসে বড় বড় পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন সেগুলা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই—সবগুলা মিলাইয়া এক একটা বড় বড় তাল পাকাইয়া একেবারে এক এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণ করিতেছি না। ইট্, সুরকি, কড়ি, বরগা, বালি, চুন, যখন পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত কর। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মত দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে

বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোন পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোন আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোন একটা শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মালমস্‌লা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট পাটকেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্ম্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনি কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিষটা যখনি হাতে আসে তখনি তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর একদিকে জমা হইতেছে, খাদ্য একদিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর একদিকে আপনার জারক-রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল

স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলি লাঙ্গল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গা, কেবলি ঠেঙ্গা লাঠি, মুখস্থ এবং একজামিন্—আমাদের এই "মানব-জনম"-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে, যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ পীড়নের সঙ্গে, রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভাল হয়। তাহার উপর আবার এক একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পসলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ"। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে—

কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা,কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও, য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনী-শক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাররাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মত বিহার করিতে পারি না। যদিবা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্ম্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে কতক কালক্রমে ঝড়িয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং

মাখিয়া উল্কি পরিয়া পরম গর্ব্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতী বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতী কাচখণ্ড পুঁথি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতী সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চকচকে বিলাতী কথা লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতী বড় বড় ভাবগুলি লইয়া হয় ত সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসঙ্গত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কি একটা অপূর্ব্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড় বড় নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা .বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নতচিত্র

আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই ; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না ; আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না ; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না ; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখানে হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্ধুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্ধুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্ত্তমান

শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থ-জগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ অভিধানের সেতু। এই জন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চির-কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্র-ভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জ্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিষটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে

সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের একতৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষা লাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব!

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে?—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের

সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করাইয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজীশিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ-কালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও

আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্ত্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালী কখনই ইংরাজী ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালীর ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে সকল বিশেষ মাধুর্য্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনি বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায়, অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্ত্তের আহ্বানে অম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্ব্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্য্যাদা জান! ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজস্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্ফুরিত হয় তাহার গভীর মর্ম্ম কি

কথনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কি হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড় বড় ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জ্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ, রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্য্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতী সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কি কথা বলেন তাহাও

বাঙালীর অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না, আমি ওকালতী করিব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইব, ইংরাজী খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া এমন সকল ভাল ভাল ছেলের সমাদর করে না এবং ভাল ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। এমন কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। একথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট-সংসর্গ আমরা লাভ করিনা এবং সেই জন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃ-

ভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, "বাংলায় কি কোন ভাব প্রকাশ করা যায়! এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে!" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কথা পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি—দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল—আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হের-ফের ঘুচাইয়া দাও! আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হের-ফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত

Imp. 4148, dt ৭.৭.০৭

গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলি। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

১২৯৯।

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন ইংরেজিপাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজিকাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজিবক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক্, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই

ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া ত শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট্‌খেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় ত সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেম্‌নি হোক্‌ না কেন, মাটিই হউক্‌ আর সোনাই হউক্‌, যখন আনন্দের দিন আসিবে, তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরৎ আসিয়াছি। আজ সাহিত্যপরিষদ্‌ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কলেজক্লাস্‌ হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট্‌ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহত্ত্ব একেবারে

ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কি করিলে বিদেশীচালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্য্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা

ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি—আমার অনুনয়, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীনশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তি-প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে পারিবে !

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি ; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা

কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই; আমাদের জ্ঞানের চর্চ্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্ব্বল হইবেই। যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয়, তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানাস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের

মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের যেমন বহুতর অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধান-পূর্ব্বক, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্ম্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন, দূরদেশের ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জ্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ নানাপ্রকার

অসঙ্গত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত-অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না,—আমাদের দেশ যে কিরূপ, তাহা সন্ধানপূর্ব্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা-তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট্‌ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মত ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌ আপনার

আলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চ্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেথান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষৎ সার্থকতালাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুইএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃতলোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত-

লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখে না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক্ না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্বস্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত্ত, পোদ্-বাগ্দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না,

তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথিসম্বন্ধে আমাদের কত-বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্ত্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্ম্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায়, এত-বড় প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না—কিন্তু

আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্ত্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্ত্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্ত্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন—তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চস্‌মাচোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অগুকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি, তাহা যথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভাল কি মন্দ, তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কি চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সঙ্কল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো

কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তূলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা,—বালকেরা,—সকলেই যে একবয়সী ছিলাম, তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ক-কেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্ম্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেম্‌নি আশা উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া

আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাতপা ছুঁড়িতে থাকে,—তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই: প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে—কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে, তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্প বয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে, উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল—তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া-পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল, অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্য্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম,

গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজমের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম—এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

"আইডিয়া" যত বড়ই হোক্, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হোক্, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে, হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করামাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লিতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-

বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে ত অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হোক্, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মত বাহির হইলাম, ভিখারীর মত পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ,—নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দ্দিষ্ট—এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটথাম্বাজ-রাগিণীতে যতই মর্ম্মভেদী হউক্ না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝঙ্কারমধুর বেতনটি মিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এম্‌নি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে, সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে—একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্যনির্ণয় করিতে পারে না, কেবল

সংকল্পকল্পনার বিলাসসম্ভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে যে উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া শিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়ই হোক্, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহঙ্কার তৃপ্তির উপায়-স্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্ত্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড় জিনিষ কল্পনা করিলেও হইবে না, বড় দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোট মুখে বড় কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ সুরু হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চ্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চ্চা-মাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কি, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও ত ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মত পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে

বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্য্যরশ্মিনির্ম্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র-বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে;—আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমরমহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মত বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত-বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথে। কর্ম্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের

বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতে হয়;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ ত সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই;—দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই—প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্ব্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ—আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেখানে, বিদেশী লোকে কোনো দিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহনখ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না—সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী

এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্ম্মে স্বদেশ-প্রেমকে সার্থক কর। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্ম্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেণ্টের কোনো আইনপাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধদ্বারের কাছে অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্যবিষয়সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা ত শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশীভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চা কর, অভিধান সঙ্কলন কর, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ কর। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসঙ্গত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি—কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা কর, সভা কর, তর্ক কর, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জান ও তাহার পরে সহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা কর, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য

বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জ্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকালবেলায় যদি ঘন-কুয়াশা হইয়া থাকে, তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—সূর্য্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে—সূর্য্যরশ্মির ছটা থরধার কৃপাণের মত আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিনচারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে—আর ভয় নাই—গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—তখন দিগ্বিদিক্ সম্বন্ধে দশজন মিলিয়া দশপ্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া তর্ক-সভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভলক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায় বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর—তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননি, সময় নিকটবর্ত্তী

হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙ্গিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে,—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।

১৩১২

শিক্ষা-সংস্কার।

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁহারা জানেন, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে শিক্ষাসম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই।

এমন সময়ে "স্পীকার" নামক বিখ্যাত ইংরেজিসাপ্তাহিকপত্রে আইরিশ শিক্ষাসংস্কারসম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্ব্বর আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবল মাত্র আয়র্লণ্ডেই বিদ্যার চর্চ্চা জাগিয়াছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লণ্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা

করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন তাহারা আহার, বাসা, পুঁথি এবং শিক্ষা বিনামূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মত আর কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃষ্টধর্ম্মের নির্ব্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লমান্ অষ্টম শতাব্দীতে পারিস-য়ুনিভর্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত, তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষাদ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়র্লণ্ড্ আক্রমণ করে, তখন এই সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লণ্ডের যে যে স্থান এই সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, সে সকল স্থানের বড় বড় বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্ব্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল,

তখন আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তবিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লণ্ডবাসীরা জ্ঞানচর্চ্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহাদের ভাষা নিকৃষ্টসমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে "ন্যাশনাল্ স্কুল" প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুণ বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়লোক—টুয়ামের আর্চ্ বিশপ জন ম্যক্‌হেল—এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্‌সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাসনাল্ স্কুল প্রণালীর মৎলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালই বল আর মন্দই বল, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পূরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা হয়, তখন আয়র্লণ্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশানাল্ বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশীভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানাপ্রকার কঠিন

শাস্তিদ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভাল করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখী বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা (Intermediate Education)। আটাশ বৎসর ধরিয়া আয়র্লণ্ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফল স্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল। পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না, কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মন জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশজাতি কি প্রার্থনা করিতেছে ? তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার

ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্ত্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষাব্যয়ের জন্য আয়র্লণ্ডের যে বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলণ্ডে পুলিস এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। আর আয়র্লণ্ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে প্রত্যেক পুলিস ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউণ্ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় ১৩ শিলিং চার পেন্স মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশে তুলনা হইতেই পারে না। আয়র্লণ্ডের শিক্ষানীতি যে ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে, তাহা বলা যায় না—কিন্তু আয়র্লণ্ডের শিক্ষাসঙ্কটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না—আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্য্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি-পেটা এবং কুলুপখোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে,

তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কি করিয়া? প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্য্যন্ত মারামারির পর ইংরেজিভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কি খোরাকে বাঁচিয়াছে? আমরা কি ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কি রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্য্যচর্চ্চার জন্য কি উপকরণ লাভ করিয়াছে? যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চ্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া শেখা এবং লেখা, দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায়, সে বয়সের লাভ পূরালাভ নহে। যে কাঁচাবয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে, তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যশূন্য অনুর্ব্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে!

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছেনা, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার

মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজীর খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্দ্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্ব্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটিসত্ত্বেও আমরা অল্পসময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাক্‌সন্ করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মৎলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানাদিক হইতে খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির রচিত, অতি সঙ্কীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালীর ছেলেকে মানুষ হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্ব্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ

উদার জ্ঞানচর্চ্চা পোলিটিকাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী, তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চ্চা যথেষ্ট দেখা যায়—এমন কি আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতর মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের যখন সুদিন ছিল,

তখন ইংলণ্ডও কোনোজাতিসম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না— ভারতবর্ষের শিক্ষানীতিসম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এদেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক্ নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্ণমেন্টি-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে, সিণ্ডিকেটে বাঙালী থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না। গবর্ণমেণ্টের আমাদেব কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতেন্ত্র্যর একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনি আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের? অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবাব সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব্বপ্রকারে

বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষাব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

✓ বর্ত্তমানকালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টলষ্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।

✓ It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people, It is doing this now by means of,all sorts of pseudo-educational establishment which it controls : scools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitable. It is strange to see good, wise people spending their sttesgth in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠন-পত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেন না, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণ-বীজটি কি, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ—বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে ভাব জিনিষটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে কিন্তু কর্ম্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে? দেশে সম্প্রতি যে সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে?

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্ ভাবে এই শিক্ষা কার্য্য

চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কি কি বই পড়ান হইবে সে সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন "জাতীয়" ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে—তবে প্রশ্ন উঠিবে শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কি বুঝায়? "জাতীয়" শব্দটার কোনো সীমা নির্দ্দেশ হয় নাই—হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপাড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল একটা কিছু চায় সেই জন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই—কিন্তু কি চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি, যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি তবে বড় বড় নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্ব্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের

চিত্ত নিজের অভাব বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জ্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল "পষ্টারিটি" অর্থাৎ কোনো একটা অনির্দ্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আজ আপনাদের নিকটে বহুল পরিমাণে ধৈর্য্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়েদশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে।—কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাস দেওয়া জিনিষটা

পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড় একটা তফাৎ থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের অনেক তফাৎ। এমন কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর একদিনের ইতরবিশেষ ঘটে।

তবু, মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চ্চা হইতেছে সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানাভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে—লেখাপড়ায় কথায়বার্ত্তায় কাজেকর্ম্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এই জন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক তাহা নির্জ্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্য্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায় প্রাণ জোগায় না।

এই জন্য বলিতেছি য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিষ পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি সেই টেবিল সেইপ্রকার কার্য্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে,মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনও বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনও কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে ; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে ;যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয় মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন কি,বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতা-সম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিংইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়—তাহা বারিক্‌, পাগলাগারদ, হাঁসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্‌ আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যেদিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির

হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল্ পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনও বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুস্কিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এই জন্য সেই বিদ্যালয়ের এ-দেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না অথচ ইহাই জানা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কি ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি কোনো মতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের

লোকের চিত্তকে বিজ্ঞান শিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারবতর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কি করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কি শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরাণ-কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যেকালে এই সকল আশ্রম সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এই সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মত তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড় জিনিষ নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত শাধাসিধা; বৈষয়িকতা, বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড় বড় শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্‌সাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানাকিক্ হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলি শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্ব্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে

সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্ম্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের পরিবর্ত্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে কোনও উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানর মত খানিকটা নীতি উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ; —শিশুকে ভাল করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি উপদেশ জিনিষটা একটা বিরোধ। ইহা কোনমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ, হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয় অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎকথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর কিছুই নয়—অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের

সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্য ভূষণের মত জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে জীবনকেই ধর্ম্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্ম্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশী আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্য্যপালন নয় তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। সহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে ; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইটকাঠপাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের সহরেব কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্য্যের কোনো দাবি নাই—তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহাবা ইহাতেই অভ্যস্ত, এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এসম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দুরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই

চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্ম্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উহার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ চেতনের সঙ্গে নিজকে একাত্মভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছে—

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সুযোবিশ্বভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন—যিতি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি—নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা সহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ সকল কথা মিষ্টি-সিজম্ বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর মনের সুপরিণতির জন্যে যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন

না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মৎলবে নানাদিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বে যে জলস্থলআকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক্, মাতৃস্তন্যের মত তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশেরতলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্য্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক্! তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক্ নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মত তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জ্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে;—এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্য্যাপ্ত বিস্তার

স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ি, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, একথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই—তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিও না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশাল ভাবে বিচিত্র ভাবে সুন্দর ভাবে বিরাজমান। কোনো মতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া,দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানব জীবনের আরম্ভে এ কি নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! শিশু যে অ্যালজেব্রা না কষিয়াই ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সে জন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? নাজানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে

বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না! আমাদের অক্ষমতা ও বর্ব্বরতাবশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদাররমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমারা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল,—মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না—তাহাদিগকে দয়া কর।

তাই আমি বলিতেছি শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাক্ এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ, এ মিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেঁড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র-পরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চ্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্ত্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানি মোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আম

একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব্ব করিবার একটা আদর্শ সর্ব্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকক মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে, আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আস্‌বাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মত আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোন একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘর বাড়ি ও আসবাব-পত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্দ্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। যে কিন্তু দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায়

কানায় ভরিয়া উপ্‌চিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিষকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে শ্লেট পেন্সিলের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আস্‌বাবকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আস্‌বাবের প্রাচুর্য্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি—তবে আর কিছু না হউক্ হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা—এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা,—বহু আয়োজনের জটিলতা বর্ব্বরতা, বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট

হয় না বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে পাকে, ঘরের মেঝেকে মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচানকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিষটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে—সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু ত ফরমাস দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সঙ্গতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবী করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারো আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের যে সঙ্গতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবী না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের

টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়; আবার, স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়;—একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবী না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক, দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই

প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন; যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে ধর্ম্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্ত্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতই ছোট ছোট ছেলেদের উপরে কন্‌ষ্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারীর নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না?

কিন্তু এ সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি

বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো-একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড় জোর একটা প্রাইভেট্ টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ “লেখাপড়া-করে-যেই-গাড়ি-ঘোড়া-চড়ে-সেই”-শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেম্নি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতী প্রভৃতি শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে—তাহার কারণ তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়—তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ মায়ের কাছে শেখানোই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেন না, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক্ কেহ বা উকীল, কেহ বা ধনী জমিদার কেহ বা আর কিছু। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য্য এবং এইরূপে এক একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক্ ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পর দিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ মায়ের উচিত ছিল গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্ব্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়—জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই ত বন্ধডানা খাঁচার পাখীর মত বাপ মা, ধনীর ছেলেকে হাত পা

সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্ত্তব্য করিতে হইলেও এই সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই সকল ভার লইয়া করিতে হয়—ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে—এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয় কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এতবড় বন্দী এতবড় পঙ্গু আর কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে—এই সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্ব্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে

ছাড়াইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী! যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারো সাধ্য নয়,—কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধূলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা কবে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়াবোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই সঙ্কোচ নাই অভিমান নাই তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত কবিয়া দিয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব—সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা কর।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানী শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতী টীনের টবের মধ্যে বড় হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming. বাঙালীর ছেলের এমন দুর্গতি আর কি হইতে পারে! বড় হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তিবশত

যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক্, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে সকল বাপমা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জ্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে ?

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন, এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না—কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্ব্বনাশ করিতে বসে !

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনো প্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন—তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানাপ্রকার রোষ দ্বেষ অশান্তি

পক্ষপাত বিবাদ বিরোধ নিন্দা গ্লানি কু-অভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারি মধ্যে আর কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, একথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে একথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্ত্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটীর মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারিদিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে—বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক

বিধান। এই সময়ে চতুর্দ্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়—জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি—সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড় কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে—কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্ম্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসার প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা নিজকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরাণী, সেরেস্তাদার, দরোগা, ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি—তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়।—আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না—কোনও দেশেই কোনও সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্যদেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে—এ দেখিয়া আমরা

ভুলিয়াছি ;—এ ভুল যে সভাস্থলে কোনও একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা “জাতীয়” শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্ব্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বই আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড় ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলি নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে,

সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে এরূপ আশা করিয়া নূতন আর একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয়, সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে, শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না; বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে "ন মেধায়া ন বহুনা শ্রুতেন।" যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্ম্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাষ্টার, সেনেট্ ও সিণ্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, যেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব।

১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়।

জাতীয় বিদ্যালয় ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কি, সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে?

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিষই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে, এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব ত অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড় জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারে না। ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুস্কিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ্ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এ কথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না বোঝা দুইই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেণ্টের; অতএব আমাদের অভাব কি আছে না আছে, তাহা বোঝার দরুণ কোনো

কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতর দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্ম্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মী, এমন কি, অন্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক যতই আমাদের কর্ম্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে —এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব, তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে, পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে, পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না করা, সে অন্যের হাত—তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়ই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড় অনুকূল, তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে

কত-বড় শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদের আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালীর মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পবক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন—আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে—পূর্ব্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক, অসম্ভব, অসঙ্গত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত স্বল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিতলাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ

প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই—আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকা-গৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গনে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ কর—তোমরা অনুভব কর, বাঙালীজাতির শক্তির একটি সফলমূর্ত্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর, তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড় বাড়ী, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে,—তোমাদের শ্রদ্ধা,

তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালীর আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালীর ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালীর নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে, ততক্ষণ কেবলি অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যদেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়—যেটুকু মেলে, সেইটুকুতেই গর্ব্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে, সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জ্জীবপদার্থসম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই যে জাতীয়বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জ্জীব ব্যাপার নহে—আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল, সেইখানেই ইহার শেষ নহে—ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে—ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালী নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না—সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীবসত্যের সেই সমগ্রমূর্ত্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব কর—সমস্ত বাঙ্গালীজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে, তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি কর—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা-পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবী করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোট হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর—ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখ—ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড় নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে,

তোমাদের ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় ন'ই, সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না, তাহা নহে—কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরী করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্‌শন্ লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশিরাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে, তাহা নহে,—দেশের শক্তিকে দেশের কাজে-ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরীর ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ

সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়—কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দ্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালীজাতির চিরদিনের সম্বলের মত এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্ত্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? একি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন, সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, একি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করযোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে, সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান!

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকর কার্য্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয়

না। কতকগুলি কাজের মত কাজ আমাদের নিকটে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড় হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এপর্য্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইত, তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ্য কেবল কথার কথা হইলে চলে না—চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে, প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ্য রচনা করিতে পারে নাই, তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট্ ও চাকরীর সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না—কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্ম্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে—সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবী সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি—তাহাকে ভিক্ষুকের মত দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎভাব ও বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্র রূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায়, সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য এবং কর্ম্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড় হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে, তাহা নহে—কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত্ বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না—তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না।

সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ ও দুর্গম—আশার পাথেয়দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান্ জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্ব্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পাবে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি, তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্ব্বহ দুঃখ কখনই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে—আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে,

তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজিকেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল্ ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া-বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে, যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল্ সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্যদেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্যদেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না! আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক্ হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা

গর্ব্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র-দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকেল্ ইকনমিকে নিজের স্বাধীনগবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্ত্তি কিভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া-ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানাদিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল—এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না;—সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত

তাহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কি, আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে—আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে, তখনি সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া-ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ"—হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি;—"ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"—হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি—পরের বচন দিয়া না দেখি! জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরুবিদ্যার গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জ্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে, তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন কি, আমরা ভুল করিতেও সঙ্কোচবোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শতশত ভুল জড়ভাবে

মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভাল। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায়, সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক্, যেমন করিয়াই হউক্ শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব—আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ্, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখী হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তিলাভ করে—তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়—দ্বিধাবর্জ্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে—

"ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই!

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র বহুদিন এদেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেম্‌নি সকল দিক্‌ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা।

সহং বীর্য্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য্যপ্রকাশ করি।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক্‌।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ কর।

১৩১৩।

আবরণ।

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যেদিন হইতে জুতা পরিতে সুরু করিলাম, সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই

আমাদের ভার বহন করিতেছিল, এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল। এখন খালিপায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ্ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর—অবশেষে মোজা, চটি, গোড়তলা জুতা, বুট্ প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্ম্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এম্নি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড় করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়জুতাকে একটা অন্ধসংস্কারের মত জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক ত সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল; তাহার ’পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্য্যন্ত কাপড়জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে

উলঙ্গ জগতের যোগ অসঙ্কোচে অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জাবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাতফেরৎ নহে, সহরবাসী সাধারণ বাঙালী গৃহস্থও আজকাল বাড়ীর বালককে অতিথির সাম্‌নে অনাবৃত দেখিলে সঙ্কোচবোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহসম্বন্ধে সঙ্কুচিত করিয়া তোলেন।

এম্‌নি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে বয়স পর্য্যন্ত শরীরসম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়, সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না—এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ একদিন দেখিব, চৌকিটেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত, আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই; এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস্ ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপমায়ে এক্‌জিক্যুটিভ্ ও জুডীশ্যাল্

একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর দুঃখ অভিভাবকের। অকাললজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে সুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই সখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ্য হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক্ হইতে বলিতেছি। মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনোকালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত—অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কি করিয়া আপনার সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ;—তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয়প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেষ্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে—সেটা বাল্যকাল।

সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়—তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া ত শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে, তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে—আমরাই ত তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক্, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্য্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি,—সাতবছর। সে পর্য্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে পর্য্যন্ত বর্ব্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীমায়ের কোলে গড়াইয়া ধূলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মত গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যসাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস-আকাশ, মাঠ-গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে—সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাকে

যদি কাপড়-চোপড়, দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাতস্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না, সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না—কিন্তু দরজির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম, লক্ষ্মীছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালী মাথাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা, সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কিপ্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয়, শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন; বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন, এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখসম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন, অতি অকিঞ্চিৎকর পোষাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না? আমার ভাল লাগে; অতএব যেমন করিয়া হোক্, উহারও ভাল লাগা উচিত, এই

অবরণশক্তির যুক্তিতে কি জগতের চারিদিকে কেবলি দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে?

যাই হোক্, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভার কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব, এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিবোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের, তাহা নহে—ইহাতে আমাদেরও উপকাব আছে। আমবা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত কবি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমবা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্ম্মল বাল্যঅবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মত শরীরসম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা যথার্থই বর্ব্বর এবং লজ্জাব যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড়, জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু এই সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত কবিয়া রাখা সঙ্গত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনই ভাল ফল হইতে পারে না। অন্তত ভাবতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই। কোনোকালে আমরা ছিলামও না; আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা

বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিষটা যে নৈমিত্তিক,—ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলাগায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এই সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জা-রক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতির বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাত করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্বসম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্ত্তা হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্ব্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, ঐদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন

আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে, এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালিগা কিছুমাত্র লজ্জার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য, সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীরসম্বন্ধে কাপড়-জুতা-মোজা যেমন, আমাদের মনসম্বন্ধে বইজিনিষটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না—আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। প্রত্যক্ষজিনিষকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চ্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা ত শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে; চোখমুখের ভঙ্গী,

কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সঙ্গীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখকান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে,—সে একটা বই পড়িয়ামাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাষ্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিষের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়েগায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে—তেম্নি আমাদের মন বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিষকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিষটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি—জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বইপড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবী তেম্নি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক

হইয়া উঠে—এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাবাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবুনামক জীব চাকরবাকর জিনিষপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট,—যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান্ হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বইপড়া-বাবুয়ানাতেও, জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়, সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়পরা শরীরের যেমন একটা সঙ্কোচ জন্মিয়াছে, আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে—সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া আমাদের

শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না;—বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট্ সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড় কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্ত্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার; কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত্—এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা-নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা, তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই, তাহারা "সভামধ্যে ন শোভন্তে"। কিন্তু সভা ত চিরকাল চলে না। এক সময়ে ত সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়।

মুস্কিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বান্‌রা সভার বাহিরে “ন শোভন্তে”—তাঁহারা বইপড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সে-দেশের লোকে বলে “World-weariness”. লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে;—জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য, কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আস্‌বাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজাজান্‌লাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে সকল জিনিষ উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুইচারিদিন ফ্যাশানের আবর্ত্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জ্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে, তাহাই কেবল পুনঃপুন লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানীর বলদের মত ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এই বই হইতে আর এক বই উৎপন্ন হইতেছে; এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম; একজনের মত মুখে-মুখে সহস্রলোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে; অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে; এন্‌নি করিয়া পুঁথি ও কথায় অরণ্য মানুষের চারদিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে, যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই সকল বাস্তবতাবর্জ্জিত ভাবগুলা ভূতেব মত মানুষকে পাইয়া বসে; তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়; সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তূলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্ম্মের ভাণ সৃষ্ট হইতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। এই সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়—সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড় শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া

মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন ত বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে, তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল—তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয়মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই—যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে, ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে—সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চ্চের মত, চর্চ্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে—কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিত-সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্ব্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি

করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত, তাহা ছোট হউক্ বড় হউক্, খাঁটি জিনিষ হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানকে সে হিতকর্ম্ম বলিয়া মনে করে; সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে; এই সকল কথার একটুখানি এদিক্-ওদিক্ লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারিদিকে এই যে অতি নিবিড় পুঁথির অরণ্য বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলি চঞ্চল করিয়া মারিতেছে, কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিষের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা, তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে, ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুইতিন মহাকাব্য আছে, যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই—নির্ম্মল জলের মত তাহা আমাদের

পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মত তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলি ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয় ত মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয় ত রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মত ব্যাপক, যাহা বাতাসের মত মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া উপার্জ্জন করিয়া লইতে হয় ত প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতী বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি—যাহা আবর্জ্জনা, তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশীবুলি সর্ব্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া

চাই—তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখেমুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি —যেন তাহা বিদেশী ইস্কুলমাষ্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে, তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখী যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায়, তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে সব জাতির মধ্যে বিলাতীসভ্যতা নূতন প্রবেশ করে, তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়—অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে, তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেম্‌নি দেখা যায়, যে সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্ত্তারা অনেকটাপরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্ এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতীবুলি দাঁড়ের পাখীর মত আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজিকায়দায় শেখানই যে একমাত্র শিক্ষানামের যোগ্য, এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র

শ্রেয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যাসম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মত আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিতলোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা, তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে, সন্দেহ নাই; আমাদেব সহিত সর্ব্বপ্রকার-সামাজিকযোগবিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়—এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প, এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে—এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়—বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই, তাহা বাহিরে জড় হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহঙ্কার বাড়িয়া

উঠে—সেই অহঙ্কারের যেটুকু সুখ, সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম—তবে এতগুলি শিক্ষিতলোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম, যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন করিতে সকলে ব্যগ্র এবং কতকগুলা পাস্ করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া থাকে। দেশে বড় বড় শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরাণীর অভাব নাই —কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়?

কথায় কথায় অনেক কথা বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য, সে এই—বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথিব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখেমুখেই শিক্ষা দিতেন—এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এম্নি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিকটি এমন হইতে পারে

না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে—এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাঁহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। “আর্য্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন”, “খৃষ্টজন্মের দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদরচনা হইয়াছে”, এ সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি—বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্ব্বিকার—তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে—তাই আমাদের কাছে আজ এ সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মত। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে, এই সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কি করিয়া তৈরি হইতে থাকে, তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক্, তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে—এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না—বইগুলোর উপরে মনের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না ; শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন, তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিষটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ; শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাৎ করিয়া দেখিতে হয়—সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা—তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়নবশত চিরকালের মত হারায়, তবু ইহা বিদ্যা—কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এত কটা অঙ্ক, এবং এতটাপরিমাণ বি, এল্, এ, ব্লে, সি, এল্, এ, ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বলাভ করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা,—আর যাহা শিক্ষানাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে

পড়ানো বলিতে পায়, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের ’পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন, সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে—এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্ব্বিসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটাপরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্ব্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কি বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

১৩১৩

সাহিত্যসম্মিলন।

সকলেই জানেন, গত বৎসর চৈত্রমাসে বরিশাল সহিত্য-সম্মিলন-সভা আহ্বান করিয়াছিল। সেই আহ্বানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বাংলা-দেশের হৃদয়বেদনা ছিল। সে আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

তার পর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম্ম সকল সময়ে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্ম্মের কর্ম্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। ফলের বীজ যেখানে পড়ে সেইখানেই অঙ্কুরিত হইতে যদি না পায়, ঝড়ে যদি তাহাকে অন্যত্র উড়াইয়া লইয়া যায়, তবু সে ব্যর্থ হয় না, উপযুক্ত সুযোগে ভালই হইয়া থাকে।

কিন্তু কলিকাতা বড়ই কঠিন স্থান। এ ত বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ীর শানবাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার কোনো প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে একটিমাত্র, সর্ব্বদাই নানা-প্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার একশত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি একশত এক।

জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না; এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সভার কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে কাতরকণ্ঠে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমার পূর্ব্বেকার নোকরি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা আমার প্রিয় আত্মীয়, কেহ বা আমার মান্য ব্যক্তি; তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে "না" বলিবার অভ্যাস এখনো পাকে নাই বলিয়া যেখানেই তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন, সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিন্তু সকলেরই ত আমি প্রিয় ব্যক্তি এবং আত্মীয় ব্যক্তি নহি; অতএব এখানে দাঁড়াইবার আমার অধিকার কি আছে, পক্ষপাতহীন বিচারকদের কাছে তাহারও জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। জনতা-মহারাজের চাপরাস বহন করিবার এও একটা বিভ্রাট।

বরিশালের যজ্ঞকর্ত্তারা আমাকে সম্মানের পদে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বান অস্বীকার করাটাকেই আমি বিনয় বলিয়া মনে করি নাই। অতএব আমি যে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন-সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলাম, সে সম্মান আমার পক্ষে আনন্দের সহিত শিরোধার্য্য। জীবনে যাচিত এবং অযাচিত সৌভাগ্য ত মাঝে মাঝে ঘটে, নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া সেই সৌভাগ্য

গ্রহণ করিবার ভার যদি নিজেরই উপরে থাকে, তবে পৃথিবীতে কয়জন ধনী অসঙ্কোচে ধন ভোগ করিতে এবং কয়জন মানী নির্ব্বিচারে মানের দাবী করিতে পারেন? তবে ত পৃথিবীর বিস্তর বড় বড় পদ ও পদবী কুলীনকন্যার মত উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় অনাথ অবস্থাতেই দিনযাপন করিতে বাধ্য হয়। এমন সকল দৃষ্টান্তসত্ত্বেও আমিই যে কেবল সম্মান ছাড়িয়া দিয়া বিনয় প্রদর্শন করিব, এত বড় অলোকসামান্য ন্যায়ভীরুতা আমার নাই।

যেমন করিয়াই হউক্, বরিশালের সভায় যে অধিকার পাইয়াছি, সেই অধিকারের জোরেই আজ কলিকাতার মত স্থানেও এখানে দাঁড়াইতে সঙ্কোচ দূর করিলাম। আজিকার এই সভাকে আমি বরিশালের সেই সম্মিলনসভারই অনুবৃত্তি বলিয়া গণ্য করিতেছি। বরিশালের সেই আহ্বান ও আতিথ্যকেই সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইয়া আজিকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তার পরে কথা এই, কাজটা কি? বরিশালের নিমন্ত্রণপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সভার উদ্দেশ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। এই দুটি উদ্দেশ্যের দিকে হাল বাগাইয়া চলিতে হইবে, কিন্তু পথটি ত সোজা নয়। সভাস্থাপন করিয়া প্রীতিস্থাপন হয়, বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ ত সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, বরঞ্চ উল্টা হয়, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখানো যাইতে পারে। প্রীতিবিধান ও উন্নতিসাধন, জগতে এ দুটি বই আর ত সাধু উদ্দেশ্য নাই। এই দুটির সহজপথ-আবিষ্কারচেষ্টায় ধরাতল বারংবার অশ্রু এবং রক্তে অভিষিক্ত হইয়াছে, তবু আজও এক

ব্রতের ব্রতী, এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈর্ষা-কলহের অন্ত নাই ; আজও উন্নতিঅবনতি চাকার মত আবর্ত্তিত হইতেছে এবং সংসারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে অগণ্য লোক এবং তাহার ফল ভোগ করিতেছে কয়েকজন ভাগ্যবান্ মাত্র।

কিন্তু আসল কথা, অনেক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি ব্যাপারের যেমন বড় বড় নামধারী মুরুব্বি থাকেন, অনুষ্ঠানপত্রের সর্ব্বোচ্চে তাঁহাদের নামটা ছাপা থাকে, কিন্তু কোনো কাজেই তাঁহারা লাগিবেন বলিয়া কেহ আশাও করে না, তেম্‌নি কোনো অনুষ্ঠানের গোড়ায় উদ্দেশ্য বলিয়া মস্ত বড় কোনো একটা কথা সকলের উপরে আমরা লিখিয়া রাখি, মনে মনে জানা থাকে ওটা ঐখানে অমনি লেখাই রহিল। প্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যটাকেও তেম্‌নি সর্ব্বোচ্চে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে তাহার প্রতি মনোযোগ না করিলেও বোধ করি কেহই লক্ষ্য করিবেন না।

অতএব এই সম্মিলনসভার উদ্দেশ্য কি, তাহা লইয়া বৃথা আলোচনা না করিয়া, ইহার কারণটা কি, সেটা দেখা যাইতে পারে।

সাহিত্যসম্মিলনের নামে বাংলার নানা প্রদেশের লোক বরিশালে আহূত হইয়াছিল—এতকাল পরে আজই এমনতর একটা ব্যাপার যে ঘটিল, তাহার তাৎপর্য্য কি ? বাংলাসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে হঠাৎ বন্যার মত একরাত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। আসল কথাটা এই যে, সমস্ত বাংলাদেশে একটা মিলনের দক্ষিণ-হাওয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বাংলাদেশে চারিদিকে কত সমিতি, কত সম্প্রদায় যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

আজ আমরা যতরকম করিয়া পারি, মিলিতে চাই। আমরা যে-কোনো একটা উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া দিয়া যে-কোনো-একটা সূত্র লইয়া পরস্পরকে বাঁধিতে চাই। কতকাল ধরিয়া আমাদের দেশের প্রধান পক্ষেরা বলিয়া আসিয়াছেন, এক না হইতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই, কবিরা ছন্দোবন্ধে ঐক্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন, নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন তৃণ একত্র করিয়া পাকাইলে হাতীকে বাঁধা যায়—তবু দীর্ঘকাল হাতী বাঁধিবার জন্য কাহারো কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু শুভলগ্নে ঐক্যের দানা বাঁধিবার যখন সময় আসিল, তখন হঠাৎ একটা আঘাতেই সমস্ত দেশে একটা কি টান পড়িয়া গেল,—যে যেখানে পারে সেইখানেই একটা কোনো নাম লইয়া একটা কিছু সংহতির মধ্যে ধরা দিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। এখন এই আবেগ থামাইয়া রাখা দায়। স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান পড়িতেই মাতৃকক্ষের ছোটবড় সমস্ত দরজা-জান্‌লা খুলিয়া গেছে। কে আমাদিগকে চলিতে বলিতেছে। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ত পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যদি বানাইয়া বলিতে বল, তবে বড় বড় নামওয়ালা উদ্দেশ্য বানাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কুঁড়ি যে কেন বাধা ছিঁড়িয়া ফুল হইয়া ফুটিতে চায়, তাহা ফুলের বিধাতাই নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া দিলে সাধ্য কি সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার কোনো কৈফিয়ৎ নাই, তাহার একমাত্র বলিবার কথা, আমি থাকিতে পারিলাম না। বাংলাদেশের এম্‌নি একটা ক্ষ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল

তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রসি ধরিয়া উঁচুনীচু পথের কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন—আর আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই?

সে কি কথা? নাই ত কি? এ যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্য্যাদা দাবী করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব। ইহাতে কেহ ঝগড়া করিতে আসিলে চলিবে না। আমাদের অন্য ভাইরা, যাঁহারা সুদীর্ঘকাল পশ্চিমমুখে আসন করিয়া পাষাণদেবতার বধির কানটার কাছে কাঁসরঘণ্টা বাজাইতে ডান হাতটাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাই যে আমাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া আজ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবেন, এ আমরা সহ্য করিব কেন? স্বদেশের মিলনক্ষেত্রে একদিন যখন কাহারো কোন সাড়াশব্দ ছিল না, যখন ইহাকে শ্মশান বলিয়া ভ্রম হইত, তখন সাহিত্যই কোদাল কাঁধে করিয়া ইহার পথ পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিল। সেই পথ বাংলার উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই পথকে ক্রমশই চওড়া করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় পণ্যপ্রবাহী রাজপথগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার আয়োজন কে করিয়াছিল?

একবার ভাবিয়া দেখুন, বাঙালীকে আমরা যে বাঙালী বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে।

বাঙালীর ঐক্যের মূলসূত্রটি কি? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি—রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না। শতবৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, শতবৎসর পরেও সেই গান বাঙালীর কণ্ঠ হইতে উৎপাটিত করিতে পারে, এত-বড় তরবারি কোনো রাজাস্ত্রশালায় আজো শাণিত হয় নাই। এ কি সামান্য শক্তি আমাদের প্রত্যেক বাঙালীর হাতে আছে! এ শক্তি ভিক্ষালব্ধ নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই জননীর সুধাকণ্ঠ হইতে স্নেহবিগলিত এই শক্তি আমরা আনন্দের সহিত সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি এবং এই চিরন্তন শক্তিযোগে সমস্ত দূরত্ব লঙ্ঘন করিয়া, অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া আজ এই সভাতলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, উপস্থিত ও অনাগতের, সমস্ত বাঙালীকে আপন উদ্বেল হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারী হইয়াছি।

বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীকে গাঁথিবার জন্য কতকাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য হৃদয়তন্তুনির্ম্মিত নানারঙের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহা আমাদের এত বেশি অঙ্গীভূত হইয়া গেছে যে, তাহা আমাদের শিরা পেশি প্রভৃতির মত আমাদের চোখেই পড়িতে চায় না। এদিকে রাজকীয় মন্ত্রণাসভায় এই একজন দেশীয়-মন্ত্রি-নিয়োগ বা

পৌরসভায় দুইচারিজন দেশীয়-প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের শূন্যগর্ভ বিড়ম্বনাকেই আমরা পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। ঔষধ যতই কটু হয়, তাহাকে ততই হিতকর বলিয়া ভ্রম হয়—যে চেষ্টায় যত বেশি ব্যর্থ কষ্ট, তাহার ফলটুকুকে ততই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, ভাঙাপথে তৈলহীন গোরুর গাড়ির চাকার মত পণ্ডশ্রমই সব চেয়ে বেশি শব্দ করিতে থাকে—তাহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্ত ভুলিয়া থাকা কঠিন।

কিন্তু কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই, যাহা সত্য,—যাহা কষ্টকল্পনা নহে—তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়দরবারে যেম্‌নি হাত পাতিলাম, অম্‌নি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলাভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের “বন্দে মাতরং” মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।

এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু। কেন যে, তাহার কারণ এখানে বিবৃত করিয়া বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশে বলিয়াছেন—“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্”—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর কিছুই হইতে

পারে না। রস জিনিষটা কি? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয়? তাহা ত দেখিতে পাই না। ভোজনব্যাপারে যে সুখসঞ্চার হয়, তাহার মত ব্যাপকরস মানবসমাজে আর নাই, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহার অধিকার। তবু ত রসনাতৃপ্তির আনন্দ সাহিত্যে কেবলমাত্র বিদূষককে আশ্রয় করিয়া নিজেকে হাস্যকর করিয়াছে। গীতিকাব্যের ছন্দে তাহার রসলীলা প্রকাশ পায় নাই, মহাকাব্যের মহাসভা হইতে সে তিরস্কৃত। অথচ গোপনে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কবিজাতি স্বভাবতই ভোজনে অপটু বা মিষ্টান্নে অরসিক, শত্রুপক্ষেও এমন অপবাদ দেয় না।

ইহার একটা কারণ আছে। ভোজনের তৃপ্তিটুকু উদরপূরণের প্রয়োজনে প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা আব উদ্বৃত্ত থাকে না। যে রস উদ্বৃত্ত থাকে না, সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যাকুল হয় না। যেটুকু বৃষ্টি মাটির মধ্যেই শুষিয়া যায়, তাহা ত আর স্রোতের আকারে বহিয়া যাইতে পারে না। এই কারণেই রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

কতকগুলি রস আছে, যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উৎসারিত হইয়া উঠে। তাহার মুখ্যধারা আমাদের আবশ্যকে নিঃশেষ হয় এবং গৌণধারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে চায়। বীরপুরুষ মুখ্যভাবে তরবারিকে আপনার অস্ত্র বলিয়া জানে, কিন্তু বীরত্বগৌরব সেইটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারে

নাই, সে তরবারিতে কারুকার্য্য ফলাইয়াছে। কলু নিজের ঘানিকে কেবলমাত্র কাজের ঘানি করিয়াই সন্তুষ্ট—তাহার মধ্যে গৌণপ্রকাশ কিছুই নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, ঘানি কলুর মনে সেই ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই, যাহা আবশ্যক শেষ করিয়াও অনাবশ্যকে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করে। এই রসের অতিরিক্ততাই সঙ্গীতকে, ছন্দকে, নানাপ্রকার ললিতকলাকে আশ্রয় করিতে চায়। তাহাই ব্যবহারের অতীত অহেতুক হইয়া অনির্ব্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। নায়কনায়িকার যে প্রেম কেবলমাত্র দর্শনস্পর্শনের মধ্যেই গাহিয়া উঠে :—

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয় জুড়ন না গেল॥

—তার সে মুহূর্ত্তকালের দেখা-শুনা কেবল সেই মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষা সঙ্গীতের মধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বাঁচে না।

অতএব যে রস মানবের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পৎকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়—যাহা অতিরিক্ত, তাহাই সর্ব্বসাধারণের।

ময়ূরশরীরের যে উদ্যমটা অতিরিক্ত, তাহাই তাহার বিপুল পুচ্ছে

অনাবশ্যক বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠে—এই কলাপশোভা ময়ূরের একলার নহে, তাহা বিশ্বের। প্রভাতের আলোকে পাখীর আনন্দ যখন তাহার আহারবিহারের প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে, তখনি সেই গানের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে পাখী বিশ্বসাধারণের সহিত নিজের যোগস্থাপন করে। সাহিত্যেও তেম্‌নি মানুষ আষাঢ়ের মেঘের মত যে রসের ধারা এবং যে জ্ঞানের ভার নিজের প্রয়োজনের মধ্যে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকেই বিশ্বমানবের মধ্যে বর্ষণ করিতে থাকে। এই উপায়েই সাহিত্যের দ্বারাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন কি, স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ঊর্দ্ধে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে।

কোনো দেশে যখন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, তখন সেখানে সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়ে। কারণ প্রয়োজন পরকে আঘাত করে, পরকে আকর্ষণ করে না! জর্ম্মণিতে যখন লেসিং, গ্যটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কাণ্ট, হুম্বোল্‌ড্‌ সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল, তখন জর্ম্মণির বাণিজ্যতরী-রণতরী ঝড়ের মেঘের মত পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই। আজ বৈশ্যযুগে জর্ম্মণির যতই মেদবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাহার সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড বলহীন হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজও আজ নিজের ভাণ্ডার পূরণ করা, দুর্ব্বলকে দুর্ব্বলতর করা এবং সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র অ্যাংলোস্যাক্‌শন্ মহিমাকেই গণ্ডারের নাসাগ্রস্থিত একশৃঙ্গের মত ভীষণভাবে উদ্যত রাখাকেই ধর্ম্ম বলিয়া

গণ্য করিয়াছে, তাই সেখানে সাহিত্যরঙ্গভূমিতে "একে একে নিবিছে দেউটি" এবং আজ প্রায় "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।"

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে সকল ভাব বিশ্বমানবের অভিমুখীন, তাহাই সাহিত্যকে জীবনদান করে। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া-দিয়া উচ্চ-নীচ-শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেইদিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শুষ্কধর্ম্ম যখন সর্ব্বমানবের মহেশ্বরকে দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে কেবল বাচবিচার এবং ভেদবিভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমাবিভাগ করিতে ব্যগ্র হয়, তখন সাহিত্যের রসপ্লাবন শুষ্ক হইয়া যায়, কেবল তর্কবিতর্ক-বাদবিবাদের ধূলা উড়িয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বৈষ্ণবকাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সঙ্কীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝরণা বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক্ হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। আজ বাংলায় গদ্যে-পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙালীজনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত, বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যেই বাংলার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্বপশ্চিম সমস্ত প্রদেশ নিরন্তর আপনাকে মিলিত করিতেছে। নিখিল বাঙালীর এই হৃদয়সঙ্গমস্থলই বাঙালীর সর্ব্বপ্রধান

মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই আমাদের জাগ্রত-দেবতার নিত্য অধিষ্ঠান হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন, প্রীতি ও নৈপুণ্যের দ্বারা এমন ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিব, যেখানে চিরদিন আমাদের উত্তরকালীন যাত্রিগণ আশ্রয়লাভ করিতে পারিবে।

সাহিত্যের নামে আমরা আজ এই যে মিলনের সভা আহ্বান করিয়াছি, এই মিলনের বিশেষ সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্যের মূলতত্ত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। রাজনৈতিক মিলনের মধ্যে বিরোধের বীজ আছে, তাহাতে পরজাতির সহিত সংঘাত আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মিলন বিশুদ্ধ মিলন—তাহাতে পরের প্রতি বিরোধদৃষ্টি দিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তাহা একান্তভাবে স্বজাতির কল্যাণকর। বঙ্গসাহিত্যে বাঙালী নিজের যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার আত্মশক্তি হইতেই উদ্ভূত, এই কারণে সাহিত্যসম্মিলনে আমরা ক্ষুণ্ণ অভিমানের দর্পে অন্যের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিব না। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমাদের এমন সময় আসিয়াছে, যখন নানা পীড়নে নানা তাড়নায় আমরা পরসংঘাতের বেদনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না—এরূপ অবস্থা ব্যাধির অবস্থা। এমন অবস্থায় আমাদের প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু পরজাত বেদনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া নিজের মধ্যে আমরা যদি শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে চাই, যদি নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও আশার ধ্রুবতারাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া আমরা বললাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই

সাহিত্যের সম্মিলনই তাহার উপায়। যেখানে বেদনা, সেইখানেই স্বভাবত বারংবার হাত পড়ে বটে, কিন্তু ব্যথাকে বারংবার স্পর্শ-দ্বারা ব্যথিততর করিয়া তোলাহি আরোগ্যের উপায় নহে। সেই বিশেষ বেদনাকে ভুলিয়া সমস্ত দেহের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নপ্রয়োগ করিলে যথাসময়ে এই বেদনা ক্ষীণ হইয়া আসে। আমাদিগকেও এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে—দিনরাত্রি কেবল অসুখের প্রতিই সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। যেখানে আমাদের বল, যেখানে আমাদের গৌরব, সেখানেই সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলে তবেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসঞ্চার হইতে থাকিবে।

কিন্তু এ সব ত গেল ভাবের কথা—কাজের কথা কি আমাদের সভাব মধ্যে পাড়িবার কোনো স্থান নাই?

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিস্থাপন কল্যাণকর, সন্দেহ নাই; সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রীতিবন্ধন যদি ঘনিষ্ঠ হয়, সে ত ভাল কথা—কিন্তু বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রীতিবিস্তারের যে বিশেষ ফল আছে, তাহা মনে করি না। অর্থাৎ লেখকগণ পরস্পরকে ভালবাসিলেই যে তাঁহাদের রচনাকার্য্যের বিশেষ উপকার ঘটে, এমন কথা বলা যায় না। ব্যবসায়হিসাবে সাহিত্যিকগণ বিচ্ছিন্ন, স্বস্বপ্রধান—তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া, জোট করিয়া সাহিত্যের যৌথকারবার করেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের প্রণালীতে, নিজের মন্ত্রে নিজের সরস্বতীর সেবা করিয়া

থাকেন। যাঁহারা দশের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুঁথিগত বাঁধামন্ত্রে কাজ সারিতে চান, দেবী কখনই তাঁহাদিগকে অমৃতফল দান করেন না। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা অনিষ্টকর।

কার্য্যগতিকে যাঁহারা এইরূপ একাধিপত্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির অভাব, এমন কি, ঈর্ষা-কলহের সম্ভাবনা ঘটে। এক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যস্বভাবে অনেক সঙ্কীর্ণতা ও বিরূপতা আছে, তাহার সংশোধন প্রত্যেকের আন্তরিক ব্যক্তিগত চেষ্টার বিষয়—কোনো কৃত্রিম প্রণালীদ্বারা তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইলে আমাদের অদ্যকার উদ্যোগের অনেক পূর্ব্বে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত।

দ্বিতীয় কথা, মাতৃভাষার উন্নতি। গৃহের উন্নতি বলিলেই গৃহস্থের উন্নতি বুঝায়, তেম্‌নি ভাষার উন্নতির অর্থই সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু কি করিলে সাহিত্যের উন্নতিবিধান হইতে পারে, সে ভাবনা মনে উদয় হইলেও ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া কঠিন। অনাবৃষ্টির দিনে কি করিলে মেঘের আবির্ভাব হইবে, সে চিন্তা মনে আসে; কিন্তু কি করিলে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। কয়েকজনে দল বাঁধিয়া কেবল কয়েকটা রসারসিতে টান মারিলেই যে প্রতিভার রঙ্গক্ষেত্রে ঠিক আমাদের ইচ্ছামত সময়েই যবনিকা উঠিয়া যাইবে, এমনতর আশা করা যায় না।

তবে একটা কথা আছে। যেমন আমরা মানুষ গড়িতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার বসনভূষণ গড়িতে পারি, তেম্‌নি সাহিত্যের গঠনকার্য্যে পরামর্শপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার আয়োজনকার্য্য একেবারে আমাদের আয়ত্তাতীত নহে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ করা দলবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা সাধ্য।

চেষ্টার সূত্রপাত পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে; অনুকূল সময় উপস্থিত হইলেই এই উদ্যোগের গৌরব একদিন সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যে স্বদেশের কত অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য বহুতর লোকখ্যাত মুখর অনুষ্ঠানের অপেক্ষা যে কত মহৎ এবং সত্য, একদিন তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইবে।

আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি, তাহা নহে। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত-বড় একটা গালি, তাহা আমরা অনুভব করি না। বেদনাসম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা, তেম্‌নি যখন হীনতার লক্ষণগুলিসম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না, তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশে এই একান্ত অসারতার ছোট-বড় প্রমাণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। বাঙালী হইয়া বাঙালীকে, পিতাভ্রাতা-

আত্মীয়স্বজনকে ইংরেজিতে পত্র লেখা যে কত-বড় লাঞ্ছনা, তাহা আমরা অনুভবমাত্র করি না ;—আমরা যখন অসংযত করতালিদ্বারা স্বদেশী বক্তাকে এবং হিপ্‌হিপ্‌ হুর্‌রে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্যব্যক্তিকে উৎসাহ জানাইয়া থাকি, তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্ব্বরতায় আমরা কেহ সঙ্কোচমাত্র বোধ করি না ;—যে সকল অশ্রদ্ধাপরায়ণ পরদেশীর কোনোপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে, সমাজকৃত্যে আমাদের কোনোদিন কোনো আদর, কোনো আহ্বান নাই, তাহাদিগকে আমাদের দেবপূজায় ও বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গড়ের বাদ্য সহকারে প্রচুর মদ্যমাংস সেবন করানোকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা গণ্য করি, ইহার বীভৎসতা আমাদের হৃদয়ের কোথাও বাজে না। তেম্‌নি আমরা আজ অন্তত বিশপঁচিশবৎসর পরের সিংহদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নিষ্ফলযাত্রা করিয়া নিজেকে দেশহিতৈষী বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি, অথচ দেশের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না, ইহাও একটা অজ্ঞানকৃত প্রহসন। দেশের বিবরণ জানিতে, তাহার ভাষা, ভূগোল, ইতিবৃত্ত, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, মনুষ্য, তাহার কথাকাহিনী, ধর্ম্মসাহিত্যসম্বন্ধে সমস্ত রহস্য স্বচেষ্টায় উদ্‌ঘাটন করিতে লেশমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। যে দেশকে আক্রমণ করিতে হইবে, সে দেশের সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করা শত্রুপক্ষের কত আবশ্যক, তাহা আমরা জানি ; আর যে দেশের হিতসাধন করিতে হইবে, সেই দেশকেই কি জানার কোনো প্রয়োজন নাই ?

কিন্তু প্রয়োজনের কথা কেন তুলিব। যাঁহারা দেশ শাসন

করেন, তাঁহারা প্রয়োজনের গরজে দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, আর যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি ভালবাসার গরজ নাই? তাঁহারা কি দেশের অন্তঃপুরে নিজে প্রবেশ করিবেন না সেখানকার সমস্ত সংবাদের জন্য থরন্টন্-হাণ্টারের মুখের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে নিরুপায় নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া থাকিবেন?

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, কথা এবং সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ কবিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই স্থায়িভিত্তিস্থাপন। এই কারণেই, সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্ব সর্ব্বসাধারণের নিকট উৎকটরূপে প্রকাশমান না হইলেও এই সভাকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এক এক বৎসরে পর্য্যায়ক্রমে বাংলার এক এক প্রদেশে এই সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য আমি কিছুকাল হইল প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সে প্রস্তাব পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য বরিশাল-সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানে সাহিত্যপরিষদের সেই প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রথম আরম্ভ হওয়াতে আমি আশান্বিত হইয়াছি।

যে প্রদেশে সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে, প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুররূপে সফল হইবে। সেখানকার প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন

পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীনমুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোকপ্রচলিত যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা কর্ত্তব্য হইবে।

কিন্তু সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একদিনেই কাজ শেষ করিলে চলিবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই সাহিত্য-পরিষদের একটি করিয়া শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল শাখাসভা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা ছাড়া প্রধানত তন্নতন্নরূপে স্থানীয় সমস্ত বিবরণ এবং রক্ষণযোগ্য প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

স্বদেশী-বিবরণ-সংগ্রহে আমি একদিন সাহিত্যপরিষদের ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছিলাম। এইরূপে স্বচেষ্টায় দেশের হিতসাধনের উদ্দেশে স্বদেশের আবেদন ছাত্রশালার দ্বারে উপস্থিত করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদের ন্যায় প্রবীণ মণ্ডলীকে অনুরোধ করিতে আমি সাহস করিয়াছিলাম। তখনো স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই।

সেদিনকার অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম—“জননি, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, স্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে! এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতল-পাটির উপরে আমাদের ছোট বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার

অশ্রুগদ্গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।”

তখন আমাদের সময় যে কত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতাই নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন। কিন্তু এখনো আমাদের গর্ব্ব করিবার দিন আসে নাই, চেষ্টা করিবার দিন দেখা দিয়াছে মাত্র। যে সকল কাজ প্রতিদিন করিবার, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে বাহির হইতে যাহার পুরস্কার পাইবার নহে; যাহার প্রধান বাধা বাহিরের প্রতিকূলতা নহে, আমাদেরই জড়ত্ব, দেশের প্রতি আমাদেরই আন্তরিক ঔদাসীন্য—সেই সকল কাজেই আশাপথে নূতনপ্রবৃত্ত তরুণ জীবনগুলিকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেইজন্য বিশেষ করিয়া আজ ছাত্রদের দিকে চাহিতেছি। এ সভায় ছাত্রসম্প্রদায়ের যাঁহারা উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, প্রৌঢ়বয়সের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াও আমি ছাত্রগণকে সুদূর প্রবীণত্বের চক্ষে একদিনও ছোট করিয়া দেখি নাই।

বয়স্কমণ্ডলীর মধ্যে যখন দেখিতে পাই, তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যা লইয়াই আছেন; প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সজীব শিক্ষাকে তাঁহারা আমল দেন না; যখন দেখি, চিরাভ্যস্ত একই চক্রপথে শতসহস্রবার পরিভ্রান্ত হইবার এবং চিরোচ্চারিত বাক্যগুলিকেই উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুন আবৃত্তি করিবার প্রতি তাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা, তখন ছাত্রদিগকে জ্যোতিঃপিপাসু বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি চিত্তের অবসাদ দূর করিয়াছি। দেশের ভবিষ্যৎকে যাঁহারা

জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বহন করিয়া অম্লানতেজে শনৈঃশনৈ উদয়পথে অধিরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয়সহকারে বলিতেছি, অন্যান্য শিক্ষার সহিত স্বদেশের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের শিক্ষা যদি তাঁহাদের না জন্মে, তবে তাঁহারা কেবল পণ্ডপাণ্ডিত্য লাভ করিবেন, জ্ঞানলাভ করিবেন না। এদেশ হইতে কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য দূরদেশে গিয়া ব্যবহার্য্য-পণ্য-আকারে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসে;—পণ্যসম্বন্ধে এইরূপ দুর্ব্বল পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। বস্তুত ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতাবশত দেশের বিধাতৃদত্ত সামগ্রীকে যদি আমরা ব্যবহারেই না লাগাইতে পারি, তবে দেশের দ্রব্যে আমাদের কোন অধিকারই থাকে না, আমরা কেবল মজুরিমাত্র করি। আমাদের এই লজ্জাজনক দৈন্য দূর করার সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কোনো দ্বিধা নাই। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধেও ছাত্রদিগকে এই একইভাবে সচেতন হইতে হইবে। দেশের বিষয়ে আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষণীয়, বিদেশীর হাত দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদেশীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা আমরা কণ্ঠস্থ করিব, দেশের জ্ঞানপদার্থে আমাদের স্বায়ত্ত অধিকার থাকিবে না, দেবী ভারতীকে আমরা বিলাতী স্বর্ণকারের গহনা পরাইতে থাকিব, এ দৈন্য আমরা আর কতদিন স্বীকার করিব! আজ আমাদের যে ছাত্রগণ দেশী মোটা-কাপড় পরিতেছেন ও স্বহস্তে তাঁত-বোনা শিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহেও স্বদেশী হইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র অবকাশকালে নিজের নিবাসপ্রদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, ভাষা,

সাহিত্য, বাণিজ্য, লোকব্যবহার, ইতিহাস, জনশ্রুতির বিবরণ সাধ্যমত আহরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের সকলেরই সংগ্রহ যে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহার-যোগ্য হইবে, তাহা নহে, কিন্তু এই উপায়ে স্বাধীন জ্ঞানার্জ্জনের উদ্যম তাঁহাদের গ্রন্থভারক্লিষ্ট মনের জড়তা দূর করিয়া দিবে এবং দেশের কোনো পদার্থকেই তুচ্ছজ্ঞান না করিবার এবং দেশী সমস্ত জিনিষই নিজে দেখিবার, শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা তাঁহাদিগকে যথার্থ স্বদেশপ্রীতির দিকে অগ্রসর এবং স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিবে। কোনো প্রীতিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পরিপক্ক হইতেই পারে না,—যদি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালবাসা অক্লান্তযত্নে জানিতে ইচ্ছা করে এবং জানা হইলে ভালবাসা আরও সত্য ও সুগভীর হয়। আমাদের স্বদেশপ্রেমের সেই ভিত্তির অভাব আছে এবং আমাদের মনে সেই ভিত্তিরচনার জন্য যদি দুর্নিবার আগ্রহ উপস্থিত না হয়, তবে যেন আমরা স্বদেশপ্রেমের অভিমান না করি। যদি এই প্রেমের অভিমানী হইবার প্রকৃত অধিকার আমরা না লাভ করিতে পারি, তবে স্বদেশ আমাদের স্বদেশ নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অধিকার লাভ করা যায়। জগতে যে জাতি দেশকে ভালবাসে, সে অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুঁথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না, স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্ত্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না, এবং দেশের সমস্ত সম্পৎকে নিজের সম্পূর্ণ

ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে, বিদেশী ব্যবসায়ীর অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না। তাই আজ আমি আমাদের ছাত্রগণকে বলিতেছি, দেশের উপরে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার কর, তাহার পরে প্রেমের এবং কর্ম্মের অধিকার সহজে প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

১৩১৩।

ARY